বাঙালীর ছোট গল্প একটা কুটীর শিল্প - কিন্নর রায়

মৌহারী

মৌ ঃ মহাকাব্যের উত্তরাধিকার উপন্যাস হলে ছোট গল্পকে গীতি কবিতার উত্তরাধিকার বলা কতটা যুক্তি সঙ্গত।

কিন্নর ঃ আমার কাছে যে কোন লেখাই একটা অভিযানের মতো। এখন সেটা ছোটগল্প হতে পারে, উপন্যাস হতে পারে, প্রবন্ধও হতে পারে। তো এই অভিযান করতে গিয়ে নানারকম সমস্যা হয়। আমি ছোটগল্প বলতে বুঝি - সেটা যে সবসময় আকারে ছোট হতে হবে এমন কোন মানে নেই। আকারে বড় লেখাও ছোটগল্প হতে পারে। যদি তার ভাবগত বৈচিত্র্যে সেটা উপন্যাস না হয়ে ওঠে। এখন আমি এই ছোট ছোট ' কোটেশান' বা 'কথার' মাধ্যমে কী ভাবে বলব রবীন্দ্রনাথের মতো। ব্যক্তিগত অনুভূতি দিয়ে বলতে পারি আমার সাত আটটা ছোটগল্পের বই আছে, তাতে ২০০-২৫০ ছোটগল্প গ্রন্থিত হয়েছে, তার নিরীখে আমি বলতে পারি, ছোটগল্প হচ্ছে একটা তুঙ্গস্পর্দ্ধ, এর দিকে আমি যাত্রা করলাম, করতে করতে পৌঁছলাম বা পৌঁছলাম না সেটা বড় কথা নয়, এই যাত্রাটাই বড় কথা। অমি ছোটগল্প লেখার সময় গল্পের শেষ কখনোই ভাবি না। শেষটা যেমন হয় হতে হতে হয়ে যায় আর কি। শুটাও যে ভাবি তা নয়, তবে প্রথম লাইনটা লিখতে খুব কষ্ট হয়। প্রথম লাইনটা এসে গেলে অনেকটা লেখা যায়, সেটা উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তাই। বাংলা ছোটগল্প তো খুব তুঙ্গভ্রন্দ্বজন্দ্রত্তপ্ত। বাংলা ছোটগল্প বা বাঙালীর ছোটগল্প তো একটা কুটীর শিল্প। এমন কোন বাঙালী লেখক নেই, যিনি ভাল ছোটগল্প লেখেন নি। ফলে উপন্যাস হয়তো তিনি পারেন নি, কিন্তু অসাধারণ , অসাধারণ ছোটগল্প লিখেছেন। আম াদের এই বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ভীষণ সমৃদ্ধ এই নিয়ে বিপুল পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। একসময় হয়েছে, এখন হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে। ছোটগল্প বলতে পার অনেকটা ভ্রুনের মতো অর্থাৎ জরায়ুর ভিতর পুষের বীর্যটি যখন আস্তে আস্তে জমে, তখন ডিম্বানু যদি তাকে ধরে নেয় তাহলে সেটা আস্তে আস্তে কনসিভ করে, এই কনসিভ করার ব্যাপারটিকে আমি ছোটগল্প বা উপন্যাস বা যে কোন নির্মানের ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার বলতে পারি।

মৌ ঃ গল্পগুচ্ছ থেকে যদি গল্পগুলিকে পর পর সাজিয়ে নিতে বলি তাহলে কিভাবে নেবেন।

কিন্নর ঃ রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ থেকে গল্প বাছা আমার পক্ষে অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের সমস্তরকম প্রতিভার যে গ্রেনজার যেস্ ফুরণ তাকে ধরেই বলতে পারি যে আমার রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ভালোলাগে না। এমনকি আমাকে তুমি যদি ' গোরার কথা বলো, 'চতুরঙ্গের' কথা বলো, ' চোখের বালির ' কথা বলো আমি বলব গোরা আমার কাছে রিডারনাল বলে মনে হয়, অনেক বেশি কথা বলার বিষয় বলে মনে হয়। তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্র, মানিকবাবু বা তারাশঙ্কর, বা বিভূতিভূষণ বা সতীন াথ ভাদুড়িকে আমি রবীন্দ্রনাথ থেকে অনেক বেশি এগিয়ে রাখব। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেখানে ছোটগল্প লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ যেখানে গান লিখেছেন, যেখানে প্রবন্ধ লিখেছেন, সেখানে তিনি ছবি এঁকেছেন, সেখানে তিনি অনন্য, তাঁর ছবির ভাষা এত আধুনিক এবং এত বাঙময় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এবং ছোটগল্প তো নিশ্চয়ই। যখন তিনি পদ্মায় বোটে করে ঘুরতেন, শিলাইদহে জমিদারিচারণের সময়, সেই সময় তুমি কোন গল্পটাকে বাদ দেবে, যেমন ধর মধ্যবির্তিনী গল্পে, মুসলমানির গল্পে, ক্ষুধিত পাষাণ গল্পে ভাবোতো ক্ষুধিত পাষাণের মতো একটা গল্প বাংলায় লেখা। পাগলা মেহেরআলি চিৎকার করিয়া বলিল 'সব ঝুঁট হ্যায়, সব ঝুঁট হ্যায়'। বলাই এর মতো ওইরকম একটা প্রকৃতির চেতনার গল্পে, একটি ছেলে মাতৃহীন সে একটা শিমূলগাছে পথের উপর এনে লাগিয়েছে। কিংবা ছুটি গল্পটির কথা ভাব-ফটিক একবাঁও মেলে না। দোবাঁও মেলে না বা অতিথির তারাপদ যে ক্রমাগত পালিয়ে বেড়ায়, কিংবা ' ল্যাবরেটরী' 'রবিবার' নিশীথে' আমি

তো ওনার গল্প পড়ে একেবারে মুগ্ধ। আমার কাছে ওনার গল্পতো একেবারে অসাধারণ 'ক্ষুধিত পাষাণ' বা 'বলাই' এর মত গল্প, বা 'ল্যাবরেটরী' বা 'রবিবার' - এর মতো গল্প এই গল্প তো আমাদের শুইয়ে দেয় তুমি 'মনিহারা' যদি ভাব সেও তো একেবারে অন্যরকম ফলে রবীন্দ্রনাথকে পর পর সাজানোর কোন সম্ভাবনাই নেই। তিনি ছোটগল্পের সার্থক master artist. ওঁর 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটি আমার অত্যন্ত প্রিয়গল্প। তাছাড়া 'বলাই' 'অতিথি' গল্পও আমার খুবই প্রিয়।

মৌঃ রবীন্দ্র উত্তর ছোট গল্পের ধারায় কে বা কারা অগ্রাধিকার পাবেন। সেখানে কিন্নর রায়ের স্থানই বা কি ভাবে পর্যালোচনা করবেন।

কিন্নর ঃ রবীন্দ্রনাথের পরে যে গল্পের ধারা শু হয়েছিল বাংলায় সেই ধারায় ধরো 'কল্লোলিয়া' রা এসেছিলেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার সান্যাল, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এঁরা এসেছিলেন, জগদীশ গুপ্ত এসেছিলেন, এসেছিলেন রমেশচন্দ্র সেন, এখন কল্লোলের গল্পের কথা যদি ধরো সেখানে সবচেয়ে শক্তিশালী লেখক ছিল প্রেমেন্দ্র মিত্র। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'শুধু কেরানী', 'পুন্নাম', 'মহানগর', ' স্টোভ', ' বোনাঘাট পেরিয়ে,' 'তেলেনাপোতা অবিষ্কার', এই গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সম্পদ। প্রবোধবাবুর দুটি গল্প আমার কাছে গুত্বপূর্ণ। একটির নাম 'অঙ্গার', অন্যটির নাম 'তুচ্ছ'। শৈলজানন্দের লেখা 'শতবর্ষ' ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। 'কয়লাকুটির দেশে' উনি লিখেছেন, গল্পকিছু লিখেছেন। কিন্তু শৈলজানন্দ-অচিন্ত্যকুমারের গল্পগুলি আমাকে খুব আলোড়িত করে না। তুলনামুলক ভাবে অনেক বেশি আলোড়িত করেন রমেশচন্দ্র সেন। রমেশচন্দ্র সেনের 'সাদা ঘোড়া', যৌবন', 'ডোমের চিতা', 'খোসা', এই গল্পগুলি বাংলাসাহিত্যের চিরস্থায়ী সম্পদ বলে আমার বিশ্বাস। জগদীশগুপ্ত অসাধারণ কিছু গল্প লিখেছেন, তার 'পয়োমুখম' বলে একটি গল্প আছে খুবই ভাল গল্প। এবং মানুষের মনে গভীর গহীন অন্ধকার মর্বিডিটি এই নিয়ে জগদীশগুপ্ত কাজ করেছেন। তাকে কখনও কখনও হতাশাব্যঞ্জক লেখক, নেগেটিভ পয়েন্টের লেখক বলা হয়। এইসব কথা সমাজবিজ্ঞানীরা বলতে পারেন। কিন্তু আমার তা মনে হয় না। অমি গজেন্দ্র কুমার মিত্রের কাছে গল্প শুনেছি যে সিউড়ির কাছাকাছি একটা জায়গায় থাকতেন জগদীশ গুপ্ত। গজেনবাবু তখন বইফিরি করতেন, Salesman এর কাজ করতেন বই নিয়ে, বইছাপার Company ছিল। তো সেই খানে গিয়ে ওঁরা অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করতেন। জগদীশগুপ্ত বিড়ি খেতেন, কখনও কথা বলতেন - উনি ছিলেন একেবারে অন্যরকম মানুষ।
এর পর ধরো চল্লিশের যে লেখকেরা এসেছেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী; সন্তোষকুমার ঘোষ, নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়। এঁরা অনেকেই খুব শক্তিশালী ছিলেন। কিন্তু তাঁদের গল্প-এখন খুঁজে পাওয়া যায় কিনা এটা বলা কঠিন। জ্যোতিরিন্দ্র নাথ নন্দীর খুব ভাল ভাল গল্প আছে, 'মঙ্গলগ্রহ' বলে একটি গল্প আছে। 'তাড়িনীর বাড়ি বদল' বা 'গিরগিটি' 'বনের রাজা' খুবই ভাল গল্প। সন্তোষকুমার ঘোষের 'দ্বিজ,' 'শনি', 'মাটির পা', এইসব গল্প পড়ে একসময় অন্যরকম মনে হয়েছিল। এখন যত দিন যায় তত বুঝতে পারি এও একধরণের ছাঁচে ফেলে দেওয়া গল্প। এই ছাঁচে ফেলা গল্পের মধ্যে সন্তোষকুমার ঘোষ তো পড়েনই। তিনি নিশ্চয়ই খুব শক্তিশালী লেখক, কিন্তু গল্পটি ভেঙে বেরিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে অভিযান, এসেই অভিযান কতটা আছে তাঁর লেখার মধ্যে তা নিয়ে সংশয় জাগে। তারপর ধরো সমরেশ বসু খুবই শক্তিশালী লেখক। সন্তোষবাবুদের সমসাময়িক সুবোধ ঘোষ, এবং নরেন মিত্র, এদের কথা বলতে হয়। নরেন্দ্রনাথ মিত্র মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে যে লেখা লিখেছেন, বিশেষ করে বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবন এবং সুবোধ ঘোষের লেখা বিহার মানে আমি বলছি 'ফসিল', 'সুন্দরম', ইত্যাদি গল্পে যেভাবে এসেছে বা পরবর্তী সময়ে মধ্যবিত্ত জীবন যেভাবে এসেছে তা খুব ভাল। এরা কিছু পরবর্তী সময়ের লেখক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ঠিক পর পরই যে তিন বন্দোপাধ্যায় এবং এক ভাদুড়ী, সতীনাথ ভাদুড়ী এসেছিলেন এঁদের লেখাকে ওঁরা অতিত্রম করেছে বলে আমার মনে হয় না। মনে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নরেন মিত্র, সন্তোষ ঘোষ, বিমল কর, একটু পরে সমরেশ বসু এঁরা সবাই ভাল গল্প লিখেছেন। কিন্তু বিভূতিভূষণের গল্পের যে বিশাল ব্যাপার বা তারাশঙ্করের গল্পের যে বড় ব্যাপার সেই লেখা একেবারে অন্যরকম। আমি কোনভাবেই সন্তোষ ঘোষ বা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বা নরেন্দ্রনাথ মিত্র বা বিমলবাবুকে ছোট করছি না, ছোট করছি না সমরেশ বসুকেও এঁরা সকলেই অসাধারণ গল্প লিখেছেন তিরিশ ও চল্লিশ জুড়ে। কিন্তু বিভূতিভূষণ, মানিক, তারাশঙ্করকে ছাপিয়ে যেতে পেরেছেন কিনা এই নিয়ে আমার গভীর সংশয় অ

াছে। পরে পঞ্চাশের দশকে যারা লিখতে এলেন তাদের মধ্যে অত্যন্ত শক্তিশালী লেখক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। তার আশর্চ্য সব গল্প আছে, সেই গল্পগুলি যদি তুমি পড় তাহলে বুঝতে পারবে কি ধরনের লেখক শ্যামলবাবু। 'পরী' বা 'রাখাল কড়াই ' গল্পের কথা এখনই মনে পড়ছে, এরকম অজস্র গল্প আছে যার কোন আদি অন্ত নেই। 'উর্বরা শক্তি' নামে একটি গল্পের কথা মনে পড়ছে - তাছাড়া এইরকম ১৫ -২০ টি গল্পে কথা আমি এক্ষুনি বলতে পারি। সেই সব গল্পের ডাইমেনশান্ একেবারে অন্যরকম। মতি নন্দীর নাম এই প্রসঙ্গে করা যায়। নাম করতে হয় সৈয়দ মুজতবা সিরাজের এঁরাও সব অসাধারণ গল্প লিখেছেন। শীষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কিছু গল্প 'ট্যাক্সিসাপ', 'ত্রিকেট ', 'গঞ্জের মানুষ' বা 'প্রদীপের দৈত্য' বা দেবেশ রাযের 'দুপুর', 'হালখাতা' এই সমস্ত গল্প একেবারই অন্যরকম। দিপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জটায়ু' অসম্ভব ভাল গল্প। দিপেনের 'চর্যাপদের হরিণী ', 'অশ্বমেধের ঘোড়া' এই সব গল্প একেবারে আলোড়ন তোলা গল্প। এদের থেকে একটু সিনিয়র মহাশ্বেতা দেবীও অসাধারণ সব গল্প লিখেছেন। বাংলা ছোট গল্পের একটা ট্র্যাডিশন্ বা ধারাবাহিকতা এঁরা তৈরী করে দিয়ে গেছেন। শুধু তৈরী করা নয় একে পুষ্টও করেছেন। অসীম রায় বলে একজন লেখক ছিলেন তিনিও দাণ দাণ গল্প লিখেছেন। ' শ্রেণীশত্রু', 'অনি', 'তারি', ' প্রেমের হাল কে বোঝে শালা'। নকশাল আন্দোলনের পটভুমিতে তার 'অনি' গল্পটির কথা আমি এখনও ভুলতে পারি না। পঞ্চাশের দশকের সব চাইতে ব্যাতিত্রমী লেখক বলে মনে হয় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে। পৃথিবীর Dimension টাই এরকাছে অন্যরকম। পার্সপেক্টিভ, কন্ট্রাপার্সপেক্টিভ বলে একটা ছবির কথা আছে। শ্যামলবাবুর গল্পর ক্ষেত্রে, গদ্যভঙ্গির ক্ষেত্রে বোধহয় ব্যাপারটা খুব বেশি করে বলা যায়।
আমার গল্প সম্বন্ধেআমি কি বলব, আমার গল্প সম্বন্ধে বলবে মহাকাল, যদি আমি লিখে থাকতে পারি। পৃথিবীতে কিছুই থাকে না, এই যে আমি বললাম, মুহুর্তে তা অতীত হয়ে গেল। প্রতিটি মুহূর্তে আমরা একটা কালসমুদ্রের দিকে চলে যাচ্ছি। সেই কালসমুদ্রটার নাম হচ্ছে মৃত্যু। মায়ের গভ থেকে জন্মাবার পর আমরা জানি আর কিছু হোক না হোক মৃত্যু অবধারিত। ফলে এই বিশাল কালখন্ডে আমার মতো একজন পিপিলীকা বা কীট যে কিছুমাত্র অক্ষর রচনা করেছে, এই সব থাকবে কি থাকবে না, এটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

মৌঃ ছোটগল্প আলোচনা কালে কতগুলো পরিচিত কথা খুব ভেসে বেড়ায়, সেগুলো হল - আর্থসামাজিক - সাংস্কৃতিক বিপর্যয় ও অর্থনৈতিক চাপ, এর সঙ্গে দেশভাগ, উদ্বাস্তু স্রোত, মার্কসের তত্ত্ব, ফ্রয়েজের মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব, প্রগতি আন্দোলন (ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা ও বামপন্থী প্রবণতা) তেভাগা আন্দালন, নকশাল বাড়ি আন্দোলন ইত্যাদি। এই গুলি নিয়ে আপনি কী বলবেন।

কিন্নর ঃ এর বাইরেও নানা বিষয় নিয়ে লেখা হয়েছে। ধরো যাঁরা শাস্ত্র বিরোধী তারা শাত্র বিরোধিতা করে লিখেছেন। সেই লেখা গ্রহণীয় হয়েছে কি হয় নি সেটা পরের কথা , কিন্তু এই শাস্ত্র বিরোধিতা আন্দোলন তো ষাটের দশকেই হয়েছে। ফলে এরবাইরেও লেখা হয়েছে। তুমি এই ঘটনাঘুলোকে এতবড় করে আনছো কেন? পৃথিবীতে বড় বড় সাম্রাজ্য এসেছে এবং চলে গেছে। রোমান সাম্রাজ্য, গ্রীক সাম্রাজ্য, মিশরের সাম্রাজ্য আজ আর নেই হরপ্পা - মহেঞ্জোদারো লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু চার - পাঁচটা বেসিক বিষয় মানুষের থেকে গেছে। লোভ, লালসা দখলের প্রবণতা তা সে অন্যের জমিই হোক বা নারী, আমি বেশি বিষয় ভোগ করব, আবার চাঁদ দেখে পাগল হয়ে কাঁদব বা নদীর সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকব বা পাখীর কুজন শুনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকব - পৃথিবীতে থাকে কি বলো তো , থাকে কেবল কিছু দীর্ঘশ্বাস, কিছু স্থাপত্য, সঙ্গীতের কয়েকটি কণা, আর সুন্দরীর অশ্রুজল ওষ্ঠবিভঙ্গ, শিশুর হাসি, পাখির কলতান, সমুদ্রের কলোচ্ছাস, নদীর বয়ে যাওয়া শব্দ, বনের বনজ গন্ধ, বা ফুলের সুবাস - সেখানে তেভাগাই বা কত বড় নকশালবাড়ী ই বা কত বড়। এগুলোকে ছোট করছি না, কিন্তু এক বিশাল আনবিক যুদ্ধে, জলোচ্ছাসে বা ভুমিকম্পে পৃথিবী যদি ধবংস হয়ে যায় কোথায় থাকবে তেভাগা, কোথায় থাকবে সাংস্কৃতিক বিপ্লব, কোথায় থাকবে নকশালবাড়ি কিছুই থাকবে না। তাহলে কি থাকবে মানুষ যদি আবার ভেসে ওঠে তাহলে সূর্যকে দেখে আবারও অবাক হবে, অবাক হবে চাঁদের জ্যোৎস্নাতে, অবাক হবে পাখির কৃজন শুনে, কাজেই পৃথিবীর এই ঘটনাগুলি অবশ্যই গুত্বপূর্ণ। কিন্তু ঘটনাপুঞ্জ মাত্রেই তাকে নিয়ে বিরাট বাড়াবাড়ি করার কিছুই নেই, গল্প এর মধ্যে থেকেও আসতেপারে , এর বাইরে থেকেও আসতে পারে।

মৌঃ আধুনিকতা যদি সমস্ত গ্রহণের মানসিকতা বোঝায় তাহলে বাংলা ছোট গল্প কী আধুনিক। ছোট গল্পে যৌনতা, সমকামীতা, কতখানি এসেছে বর্তমানে।

কিন্নর ঃ বাংলা গল্পে যৌনতা তো অবশ্যই এসেছে। কিন্তু কতটা সাবালক ভাবে এসেছে এনিয়ে সংশয় আছে। সমরেশ বসুর লেখার মধ্যে একসময় যৌনতার আধিক্য বা বাড়াবাড়ির অভিযোগও এসেছে। মামলা হয়েছে ওনার লেখা নিয়ে। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের লেখার মধ্যে যৌনতার তীব্রতা খুব দেখা যায়। মানিকবাবুর প্রাগৈতিহাসিক প্রভৃতি গল্পের মধ্যে যৌনতার ছোঁয়া ছিল। আসলে যৌনতা তো কোন অশুচি ব্যাপার নয়, কোন আঁশটে গন্ধআলা ব্যাপার নয় যে গেলো গেলো ম'লো ম'লো ব্যাপার - এগুলোতো জীবনেরই অঙ্গ। কাজেই যৌনতা থাকবে।
সমকামিতা নিয়েও লেখা হয়েছে বাংলায়। শ্যামলদার একটি গল্প আছে, এই মুহূর্তে নামটা মনে পড়ছে না, একটি অসাধারণ গল্প। একজন পেইন্টারকে নিয় লেখা , সমকামিতার গল্প। খুব আবছা করে লেখা , আবছা করে বলা। আমারও সমকামিতার ওপর দু - একটি গল্প আছে,। কতটা লিখতে পেরেছি জানি না, হয়ত হয়নি, তবে চেষ্টা করেছি। যৌনতা সম্বন্ধে যতটুকু বলা প্রয়োজন ততটুকু খোলা মেলা ভাবেই বলা ভাল। কিন্তু শিল্পের মোড়ক ছাড়া তো কিছু হয় না তাহলে তো খবরের কাগজের রিপোর্ট আর গল্প এক হয়ে যাবে। জগদীশ গুপ্তের গল্পেও যৌনতা ব্যাপক ভাবে আছে। লেখকেরা কি ভাবে যৌনতা আনবেন তা তাদের ব্যাপার।

মৌ ঃ বহির্জাগতিক প্রচন্ডতায় একের পর এক অভিঘাতে ভেঙে পড়েছে যাবতীয় মূল্যবোধ। এই স্থানে বাংলা ছোট গল্প কী ভূমিকা পালন করছে?

কিন্নর ঃ লেখক কেন সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব নেবে। কিন্তু সে কিছু ভাল সাজেশন তুলে ধরতে পারে। এই সাজেশন্ যেন বানানো না হয়। যেমন দেখানো হয় সব ঠিক হল এবং শেষে নায়ক নায়িকা মিলে গেল, সেরকম যেন না হয়। সামাজিক প্রেক্ষিত দেখাতে গিয়ে একটা ইচ্ছা পূরণ যেন না হয়। তবে লেখকদের দায়িত্ব তো কিছু আছেই, যেহেতু তিনি সমাজে থাকেন, খাদ্য-বাতাস নেন, ফলে এই পৃথিবীর প্রতি কিছু দায় - দায়িত্ব তাঁর আছে। আবারও জোর দিয়ে বলি লেখক কিন্তু সমাজ বদলে কোন দায়িত্ব নেবেন না, তিনি কিছু ধারণা তৈরী করে দেবেন, কিছু শব্দ তৈরী করে দেবেন। তিনি স্বপ্ন দেখাবেন।

মৌ ঃ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে ভাঙনের ইশারা দুর্লক্ষ্য নয়, কিন্তু সংসার তখনো স্থিতিশীল - তাহলে এই ভাঙন কিসের ইঙ্গিতবাহী।

কিন্নর ঃ এখানেও আমার কিছু বক্তব্য আছে, আমাদের দেশে যারা সাহিত্য সমালোচক তারা সবসময়ই খুব প্রেমবন্দী হয়ে কথা বার্তা বলেন, দু'চারজন বাদ দিয়ে। ফলে সেখানে প্রত্যেকটা খোপের মধ্যে এক একজন লেখককে পুরে দেওয়া হয় যেমন মানিকবাবুকে বলা হয়ে ফ্রয়েদিয়ান মানিক, কমিউনিষ্ট মানিক দুটো ভাগ। তারাশঙ্কর ক্ষয়িষ্ণু জমিদার তন্ত্রের প্রতীক পরে কংগ্রেস রাজনীতি করেছেন। ঈশ্বরবিশ্বাসী লোক, সেভাবে সমাজসচেতন নন এবং মানুষের ছোটখাটো সুখ দুঃখ নিয়ে আলোচনা করেছেন ভূত প্রেতের লেখক, প্রকৃতি গাছ পাখি এসব ভালোবাসতেন। এইসমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে বেমানান মনে হয়। যেমন মানিকবাবুর ডায়েরি দেখো। 'এক্ষণ' - এ ওঁনার ডায়েরি বেরিয়েছে পরে যুগান্তর চক্রবর্ত্তী যে ডায়েরী সম্পাদনা করেছেন তাতে বারবার মাকালীর কথা ঈশ্বরের কথা এসেছে। সেই মাকালী বা ঈশ্বর কে সেটা বড় ব্যাপার নয়, বড় ব্যাপার তিনি ঈশ্বরের কথা বলেছেন, ঈশ্বরের কথা বলা কোন অন্যায় নয়, কিন্তু একজন কমিউনিষ্ট ঈশ্বরের কথা বলেছেন - এটা নিয়ে আমি তর্ক - বিতর্কের মধ্যে যাচ্ছি না - মানিকবাবু বলেছেন এ কথা। এখানেই ফ্রেম ভাঙছে। নিজের মদ্যপানের যে অভ্যাস - আজও ডি মানে আজও মদ খেলাম - এই যে ব্যপারগুলো উনি ডায়েরিতে বলেছেন। আবার ত

ারাশঙ্কর কে যে বলা হয় তিনি ক্ষয়িষ্ণু জমিদার তন্ত্রের লেখক তাও ফ্রেম বন্দী করারই প্রবণতা। সমালোচকদের দেগে দেওয়ার ব্যাপার। তাঁর কবি বা হাসুলী বাঁক বা গণদেবতা কিংবা রাধা বলে যে ছোট উপন্যাস আছে তার কথা ধরি ত াহলে তো নানা রকম মাত্রার তারাশঙ্কর বেরিয়ে আসছেন। তিনি শুধুই ক্ষয়িষ্ণু জমিদার তন্ত্রের প্রতীক নন। তারাশঙ্কর কংগ্রেস আন্দোলন করে জেলে গিয়েছেন স্বাধীনতার আগে। প্রায় একবছর ছিলেন তিনি সিউড়ী জেলে, এসব বিবরণ তাঁর আত্মজীবনীমূলক লেখায় তিনি লিখে গেছেন। তারাশঙ্কর মানুষের সঙ্গে ঘোরা লোক, তিনি গ্রাম জানতেন, ধানের নাম জ ানতেন, তিনি মানুষের যে Land Relation - অর্থাৎ জমির সম্পর্ক - ভারতীয় কৃষক, জমিদার, মহাজন এদের সঙ্গে যে জমির সম্পর্ক এসব খুব ভাল মতন জানতেন। তাঁর ভাষায় হয়ত বিভূতিভূষণের মতো স্পনটিনিটি নেই বা মানিকবাবুর মতো পোয়েট্রি নেই, কিন্তু যে লেখক 'আরোগ্য নিকেতন' বা 'কবি' লিখতে পারেন সে নিঃসন্দেহে গুত্বপূর্ণ লেখক। ভ ারতীয় মৃত্যু বোধের চেতনার ওপর তারাশঙ্করের চিন্তা প্রথিত। এরকমই বিভূতিভূষণ সম্পর্কে সবচাইতে ভুল বিচার হয়েছে আমাদের দেশে। আমাদের দেশের সমালোচকরা বিভূতিভূষণকে একেবারে বুঝতে পারে নি। যেমন জীবনানন্দ দ াশকে বুঝতে পারে নি। কেননা কোন ফ্রেমে বিভূতিবাবুকে আটকানো যায় না। আমার সবচাইতে পছন্দের লেখক এই তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে বিভূতিবাবুই। বিভুতিভূষণের গল্পের কোন শুও নেই কোন শেষও নেই, - ভারতীয় কথকথার মতো অর্থাৎ এখানেও শেষ করা যায়। আবার একমাইল ধরে বলাও যায়। কোনভাবেই বিভুতিবাবুকে আটকানো যায় না - এই যে তুমি প্রশ্ন করেছ যে ভাঙ্গনের ইশারা, তাঁর লেখার মধ্যে ভাঙ্গনের ইশারা আছে , যদিও তিনি প্রসন্নতায় বিশ্বাসী। মানুষের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু তিনি খুব নিষ্ঠুরও ছিলেন। তাঁর লেখা যদি খুঁটিয়ে পড়ো দেখবে তিনি কি অসম্ভব নিষ্ঠুর মানুষ। কোন পোয়েটিক নিষ্ঠুরতা না থাকলে দুর্গার মৃত্যুদৃশ্য আঁকা যায় না। কিংবা অপরাজিতায় যেখানে মা মারা গেছেন যেখানে অপু রিলেটেড মায়ের মৃত্যর পর অপুর ঘাড় থেকে যেন দায় নেমে গেছে। অপু একেবারে মুক্ত মানুষ - এই যে বোধ। কিংবা 'অশনিসংকেতের ' ঐ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের বিবরণ এবং সেখানে গ্রামীণ অর্থনীতির ভেঙ্গে পড়ার নিষ্করুণ চালচিত্র - কোথাও কোন মন্তব্য না করে বলা যায় অপূর্ব। তুমি বলবে বিভূতিভূষণ ফ্রয়েড, মার্কস্ এগুলি খুব লাউডলি বলেন নি, কিন্তু উনি যে পড়ালেখা জানা লোক ছিলেন না এরকম নন। উনি খুব মন দিয়ে পৃথিবীর ইতিহাস, মহাকাশের খেলা নক্ষত্র, লোকজীবন এসব পড়তেন এবং Stant magazine পড়তেন। ভ্রমণ কাহিনী পড়তেন এবং তুমি ভাব 'চাঁদের পাহারের' মত লেখা শুধুমাত্র ভ্রমন কাহিনী পড়ে লেখা, তিনি আফ্রিকায় যান নি, ভাবো তো কি সাংঘাতিক, কাজেই বিভূতিবাবু ঠিকমত সমালোচিত হন নি বলে আমার মত। আমাদের জীবনে চার - পাঁচটা বেসিক জিনিস আছে - জীবন ও মৃত্য এই যে একটা মান, এর মধ্যেও কতকগুলি ব্যাপার আছে যেমন আছে প্রেম, ভালোবাসা, নিসর্গ, আহ্লাদ, বিষাদ এই যে মূল ব্যাপারগুলি এইগুলোই বিভূতিবাবু ছুঁয়ে গেছেন। বিভূতিবাবুর এই সব লেখাগুলো মুছে দেওয়া যায় না। যখনই বাঙালী পাঠক অপু পড়ে তখনই সে অপু হয়ে যায়। সত্যজিত রায় বলছেন আমিই অপু। কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের তো অপু মনে হওয়ার কোন কারণ নেই তিনি যে ব্রাহ্ম পরিমন্ডলে মানুষ, অপুর পরিমণ্ডল তো একেবারেই তা নয়, পুরোহিত তন্ত্রের পরিমন্ডল, কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের কোথাও যেন একটা মনে হত তিনিই অপু। এই যে সার্বজনীন বা চিরকালীন বোধ জাগ্রত করা এটা বিভুতিবাবু পেরেছেন।

মৌ ঃ ছোট গল্প একান্ত ভাবে রসাশ্রয়ী। স্মিত লোকের বিকীর্ণ রশ্মি ও কণ অর্থাৎ স্মিত ও কণ এই রসের সহযোগী রস কৌতুকই ছোট গল্পের বিশেষ উপযোগী। মানে হিউমার ছোটগল্পের ফল্গুশ্রোত, তাহলে শিবরাম চক্রবর্তী সিরিয়াস লেখকের মর্যাদা পান না কেন? যেখানে তিনি পরশুরাম, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, ত্রৈলোক্যনাথের সমকক্ষ।

কিন্নর ঃ শিবরাম একেবারেই হাল্কা লেখক নন। আসলে আমাদের পাঠক প্রিয়তা বা পাঠক চি - এবিষয়ে কতগুলি ব্যাপ ার আছে। এখন ধরো, এবিষয়ে লেখকদেরও দোষ আছে, পাঠকদেরও দোষ আছে। লেখকরা তো খুব একটা মর্যাদা প ান না, অর্থের মর্যাদা পান না, স্বীকৃতির মর্যাদাও পান না। শিবরাম বাবু চাকুরি করতেন না, ফলে হয়তো দেখা গেল তিনি 'মস্কো বনাম পন্ডিচারী' লিখলেন কিন্তু বিক্রি হল না, তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হল না। 'চুম্বন' নামে তিনি যে কবিতা লিখেছিলেন সেটাও তাকে সেভাবে স্বীকৃতি দিল না। তিনি দেখলেন হাসির লেখাটা লোকে খায়। 'বিনির উপাখ্যান',

'ইতুর সঙ্গে ইত্যাদি' লিখলে বা 'হাতির সঙ্গে হাতাহাতি' লিখলে বা 'হর্ষবর্ধন- গোবর্ধন' লিখলে ব্যাপারটা ভাল বিক্রি হয় এবং প্রকাশক চায় বা সম্পাদকরা চায়, ফলে শিবরাম একটা বৃত্তের মধ্যে পড়ে গেলেন। এই বৃত্ত লেখকের খুব ক্ষতি করে। একজন লেখক নিজে একটা টাইপ তৈরী করে ফেলেন সেই টাইপ ভেঙ্গে বারবার তাকে বেরিয়ে যেতে হয়। শিবরাম খুবই বড় লেখক। তার 'ঈশ্বর - প্রীতি - ভালবাসা' ও 'ভালবাসা - প্রীতি - ঈশ্বর ' এই দুটো লেখা পড়লেই বোঝা যায় তিনি কোন মাপের লেখক। তার সমস্ত গল্পই বাচচাদের ছ্যাবলা গল্প; আমি হাসির গল্পও বলব না। তিনি এগুলো লিখলেও তুমি যাঁদের নাম করেছ - তবে রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের কথা আমি জানি না, কিন্তু পরশুরাম ও ত্রৈলোক্যনাথ খুবই বড় মাপের লেখক শিবরাম বাবু অবশ্যই এদের সমগোত্রীয়। ত্রৈলোক্যনাথের 'কঙ্কাবতী' বা 'লুল্লু ভুতের কথা ' বা পরশুরামের একাধিক লেখা 'কচিসংসাদ' 'হনুমানের স্বপ্ন', 'কজ্জলী' আমি কোনটা ছেড়ে কোনটা বলব। বা 'গড্ডালিকা' যে কোন লেখাই একেবারে অন্য স্বাদের লেখা। রাজশেখর বসু আমার অবাক লাগে একজন মানুষ তিনি কি ভাবে অভিধান রচনা করেছেন, অত সিরিয়াস ছিলেন এবং উপন্যাস লেখেন নি, লেখা শু করেছিলেন খানিকটা মধ্যবয়স পেরিয়ে এসে এবং খুব বেশি লেখেন নি শুধু মহাভারতের উপর কাজটি এবং চলন্তিকার মতো ওই পরিশ্রমী কাজ এবং হাসির ওই কয়েকটি লেখা লিখে তিনি নিজের একটা জায়গা করে নিয়েছেন ফলে ছোটগল্প রসাশ্রয়ী বলেছ ঠিকই, ওই যে কোন রস স্মিত রস ওইসব আলাদা আলাদা রস এখনকার গল্পে মিলেমিশে গেছে। এখন গল্প তো অনেক বদলে গেছে। ঠিক কাহিনী প্রধান গল্প মানে কাহিনীর আখ্যান অবশ্যই একটা থাকছে কিন্তু ওই রকম একটা সোজা স্টোরি লাইন নেই। আমি 'নিখোঁজ' বলে একটা গল্প লিখেছিলাম। সেই গল্পটিতে সরোজ দত্তের হারিয়ে যাওয়ার গল্প আছে। আবার ভিখারী পাশোয়ান যে চটকলের শ্রমিক তারও হারিয়ে যাওয়ার কথা আছে। এই ব্যাপারকে ভুষুন্ডি কাক বলে একজন কাক অনেক প্রাচীন পুরানের কাক সে ব্যাপারটিকে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। তা আমাদের সময়ে যারা লিখছেন তারা প্রত্যেকেই কিছু কিছু লিখেছেন, খুব ভাল লেখা লিখেছেন। সেই লেখা খুব কম পড়া হয়েছে সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য। একই দুর্ভাগ্যের স্বীকার শিবরাম বাবুও।

মৌঃ তেলেনাপোতা কি কমলাকান্তের দপ্তরের মত উত্তরাধিকার বিহীন?

কিন্নর ঃ প্রেমেন্দ্র মিত্র বাংলা ছোট গল্পের একজন খুব বড় সার্থক শিল্পী। যদিও তিনি 'গল্পগুচছ' ঘরানারই লেখক। তবুও জানো আমি কিন্তু শুধু তেলেনাপোতা নয় তাঁর অন্যান্য গল্পগুলিকেও বলব ফ্রেমের গল্প। কারণ আমি তাঁর গল্পের শু এবং শেষ দেখতে পাই। অনেকটা নদীর মত, বয়ে গিয়ে হয় অন্য একটা নদীতে মেশে, নয় সাগরে মেশে। তেলেনাপোতাও আজ আর পড়লে বিস্ময়কর মনে হয় না। যদিও কথাটা একটু সাহস করেই বললাম। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত আলাপ ছিল, তাঁর বাড়ীতে দিনের পর দিন গেছি একসময়। উনি আমায় খুব স্নেহ করতেন। কিন্তু এখন বলবো তেলেনাপোতা পড়ে আমি খুব রোমাঞ্চিত হব না যতটা হব 'পুঁইমাচা' পড়ে, 'কিন্নরদল' পড়ে, 'মেঘমল্লার' পড়ে।

মৌঃ কমলকুমার মজুমদারের গদ্যরীতি সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?
কিন্নর ঃ কমলকুমার নিঃসন্দেহে বড় লেখক, কিন্তু তাঁর ভাষা সম্বন্ধেআমার আপত্তি আছে, একথাটা আগে বলতে পারতাম না এখন বলতে পারি। ভাষা পড়ে যদি আমি আরাম না পাই, এটা যদি আমার পক্ষে দুরঅতিক্রান্ত হয়, অনতিক্রমনীয় হয় তবে তা আরাম দেয় না। কমলবাবু 'ফৌজিবন্দুক' যখন লিখেছেন বা 'মতিলাল পাদরী' যখন লিখেছেন তখন তার ভাষার মধ্যে জাড্য ছিল না কিন্তু 'পিঞ্জুরে বসিয়া সুখ' পাতার পর পাতর খালি বর্ণনা। কিংবা 'সুহাসিনীর টমেটম' বা 'গোলাপ সুন্দরী' সব একই গোত্রের কিন্তু 'অন্তর্জলী যাত্রা' পড়তে খুবই ভাল লাগে। সেখানেও কাঠিন্য আছে, আছে শক্ত ব্যাপার কাজেই কমলবাবু সম্বন্ধে বলা যায় তার রচনায় আরাম পাই না। আবার 'আলো ক্রমে আসিতেছে' একটি দাণ রচনা একটি অসাধারণ চিত্রকল্প, একটি অসাধারণ পেইন্টিং বলে মনে হয় এক এক সময়। ওঁনার প্রথম দিকের রচনা ' ফৌজি বন্দুক' বা 'মতিলাল পাদরী' বা 'লাল জুতো' পড়ে ভাল লাগে । কিন্তু পরে মনে হয়েছে কোথাও নিজের তৈরী ফাঁদে উনি আটকা পড়ে গেছেন। স্বকীয় তৈরী ফাঁদ। যদিও আমাদের দেশের ইন্টেলেকটুয়াল - রা সরাসরি তা স্বীকার করেন না।

তবুও কমলবাবু সম্পন্ধে বলা চলে তিনি নিঃসন্দেহে বড় লেখক। লেখার মধ্যে ক্রমাগত পরীক্ষা - নিরীক্ষা চালিয়ে গেছেন। যদিও তুমি বলেছো শিল্প খানিকটা অধরাই থেকে যায় তা সে তো আরণ্যকেও আছে কিংবা অনুবর্তনেও আছে, তবুও আমার মনে হয়েছে কমলকুমারের ভাষাটা তৈরী করতে হয়েছে,। স্বতঃসারিত ভাষা নয়।

মৌ ঃ একেবারে অতিসম্প্রতি গল্পকার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন জীবনানন্দ। এই মুহূর্ত পর্যন্ত প্রায় অ - পঠিত। ওঁর ভূমিকাই আজ বেশি আলোচনা দরকার। কিন্তু তা করবো কী ভাবে।

কিন্নর ঃ জীবনানন্দের উপন্যাস আমার বেশি ভাল লাগে। জলপাইহাটি, সুতীর্থ খুবই ভাল রচনা। ওনার গল্পও ভাল, তবে সেখানে একটা রিপিটেশন্ আছে। একটি লোক বার বার এসেছে যে বউ - এর দ্বারা অপমানিত , যে চুট খায়, যার একটি বড় গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ আছে, এরকম লোকের কথা বার বার এসেছে। তা আসলে অবশ্য ক্ষতি নেই। কারণ একজন লেখক যা জীবনযাপন করেন তাইতো লিখবেন। লেখক থাকবেন শহরে মধ্যবিত্ত পরিবারে অথচ লিখতে যাবেন গ্রামীণ ভারতের আদিবাসীদের ডায়ালেক্ট সে তো এক হাস্যকর ব্যাপার। ফলে জীবনানন্দ যে জীবনে ছিলেন, সে জীবনের কথা অপমানের কথা বার বার বলেছেন। ওঁনার আলোচনার মধ্যে যে আভাস তা এক কথায় অনবদ্য। জীবনানন্দের লেখায় প্রসন্নতা কম। এই প্রসঙ্গে তিনি রবীন্দ্রনাথকে তো উত্তরই দিয়েছিলেন যে বিটোফেনে কি টেনশন নেই। আসলে তিনি তার মতো করে রচনা করে গেছেন।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com